জিহাদের ইসলামী নীতি

মাওলানা মাস্‌উদ আযহার

অনুবাদ : সৈয়দ মবনু

জিহাদের ইসলামী নীতি

মূল
মাওলানা মাসঊদ আযহার
অনুবাদ
সৈয়দ মবনু

অধ্যয়ন
২/১ জামে মসজিদ মার্কেট, বন্দরবাজার, সিলেট।
মোবাইল ০১৭১ ১২৬০৮৩

মাওলানা মাসউদ আযহারের জীবন ও কর্ম

জাতিসংঘের কাছে আমরা কেন দাবী করবো? জাতিসংঘের কি বসনিয়ার পঁচিশ হাজার মাসুম বাচ্চাদের রক্ত দৃষ্টিতে আসছে না? জাতিসংঘের (মহাসচিব) বুট্রোস ঘালির কি কাশ্মিরে প্রবাহিত রক্ত যা সমুদ্রের পানিকে লালে লাল করে দিয়েছে, তা দৃষ্টিপাত হচ্ছে না? ওরা গোটা বিশ্বে খৃষ্টান আর ইহুদীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আজ যদি গোটা বিশ্বে প্রকৃত কোন এতিম থেকে থাকে তবে সে হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মত; যাদের মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখার মত আজ কেউ নেই। যাদের মা-বোনেরা অন্যায়ভাবে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাচ্চা জন্ম দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করছে যাদের গর্ভবর্তী মহিলারাও গণহারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, কিন্তু প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধকারী কেউ নেই এটা আমাদের অপরাধ এবং এজন্য আমরাই অপরাধী। আমাদেরকে মহানবী (সা.) জিহাদ শিখিয়েছিলেন এবং তলোয়ার আর ঘোড়া দিয়েছিলেন বোখারী শরীফ হাতে নিয়ে দেখুন; মহানবী (সা.) নিজের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই রেখে যাননি। হে আমার মুজাহিদ বন্ধুগণ! সংকল্প করুন; ইসলামের সকল মাসয়ালার জন্য নিজের প্রাণের নজরানা দেবেন, নিজের রক্ত প্রবাহিত করবেন তবু শত্রুর সামনে নিজের অস্তিত্বকে বাঁকা হতে দেবে না। (মুজাহিদ কমান্ডার জেনারেল মাওলানা মাসউদ আজহার)

ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) এর রূহানী সন্তান, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মালটার জেলে বন্দী মুজাহিদে মিল-াত শায়খুলহিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানতুবী (র.)এর বিপ্লবী উত্তরাধিকারী, বালাকোটের মুজাহিদ কমান্ডার জেনারেল সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ (র.) এর জিহাদী দর্শনের বাহক, মিসরের কারাগারে শহীদ সৈয়দ কুতুব (র.), আমেরিকার জেলে বন্দী অন্ধ আলেম ওমর আব্দুর রহমান প্রমুখদের পথের পথিক, ইতিহাসের জিহাদী বন্দীদের এক নক্ষত্র হযরত মাওলানা মাসউদ আজহার। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে ১৯৯৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তখন তাঁর সাথে ছিলেন আন্তর্জাতিক হরকতুল আনসারের কমান্ডার শায়েখ সাজ্জাদ শাহেদ। এরপর থেকে দীর্ঘদিন তিনি ভারতের জেলে ছিলেন। ভারত সরকার তাঁর উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চালিয়েছে। মাওলানা মাসউদ আযহার ১৯৯৩সনে এক সংক্ষিপ্ত সফরে

ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। ১৯৯৪সনে ২৬ জানুয়ারী তিনি লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে কাশ্মীরে পৌছেন এবং ১০ ফেব্রুয়ারী তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মাওলানা মাসউদ আযহারের জন্ম ১৯৯৮সনে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরের এক ধার্মিক ও জ্ঞানী পরিবারে। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লাহ বখত সাবর ছিলেন বাহাওয়ালপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার স্কুলে পড়েন। তাঁর পিতার একান্ত ইচ্ছায় এরপর তিনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যান। তাঁর মাদ্রাসা জীবন শুরু হয় আল্লামা বিন নূরী শহরের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা জামেয়া উলুমে ইসলামিয়ায়। বাহাওয়ালপুর থেকে আল্লামা বিন নূরী শহর বেশ দূরে, তাই তাঁকে মাদ্রাসার হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করতে হয়। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শায়েখ মুফতি আহমদুর রহমানের সহবতে থেকে মাসউদ আযহার লেখা পড়ার সাথে সাথে নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলেন। ছাত্রজীবনে তিনি মাদ্রাসায় সকল শিক্ষকের স্নেহভাজন ছিলেন। বিশেষ করে মুফতি ওয়ালী হোসেন, মাওলানা ইদ্রিস, ড. আব্দুর রাজ্জাক ইসকান্দার, মাওলানা মোহাম্মদ সাহেব, মাওলানা রেজাউল হক প্রমুখ। শিক্ষকগণ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন উর্বরমেধা এবং উন্নত চরিত্রের জন্য। ক্লাশে তিনি সর্বদা প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন। মাদ্রাসার সাহিত্য ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সবসময় তিনি প্রথম স্থানে থাকতেন। ইসলামী জ্ঞান অর্জনে তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন ততই তাঁর চরিত্র উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ছাত্র জীবনেই তিনি করাচীর দিল্লী কলোনী জামে মসজিদে জুম্মার খতিবের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর খুৎবাহ শুনার জন্য অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মুসল্লীরা আসতেন। নামাজ শেষে অনেকেই তাঁর কাছে সমবেত হতেন বিশেষ নসীহতের জন্য। মুসল্লীরা তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। জীবনে যে কেউ একবার তাঁর সহবত পেয়ে গেছেন তিনি আর ভুলতে পারেননি। মাওলানা মাসউদ আযহার নিজে যা বলতেন প্রথমে তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতেন। জামেয়া উলুমে ইসলামিয়া থেকে তিনি টাইটেল দিয়ে প্রিন্সিপাল মুফতি আহমদুর রহমানের নির্দেশে উক্ত মাদ্রাসায়ই শিক্ষকতা শুরু করে দেন। এই সময় আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের প্রচন্ড লড়াই চলছে। আফগানিস্তান থেকে মুজাহিদ কমান্ডার আখতার মোহাম্মদকে পত্র মাধ্যমে মাওলানা মাসউদ আযহার জিহাদে অংশগ্রহণের আহবান জানান (শহীদ আখতার মোহাম্মদ গরদিজে শত্রুর বুলেটের আঘাতে শাহাদরতবরণ করেন)। ইতিমধ্যে হরকতুল মুজাহিদিনের আমীর মাওলানা ফয়জুর রহমান খলীল আফগানিস্তান থেকে জামেয়া উলুমে ইসলামিয়ায় আসেন। মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের সামনে আগফানিস্তানের জিহাদের বর্ণনা দিয়ে সবাইকে

জিহাদে অংশগ্রহণের আহবান করেন। তাঁর আহবানে প্রিন্সিপাল মুফতি আহমদুর রহমান সাহেব মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য হরকতুল জিহাদ আল ইসলামীর জিহাদ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। ওদের অনেকই আফগান জিহাদে বীর বিক্রমের মতো লড়াই করে শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মাওলানা মাসউদ আযহার প্রথমে সেখানে থেকে জিহাদ প্রশিক্ষণ দিয়ে করাচীতে চলে আসেন। মাওলানা ফয়জুর রহমানের জিহাদী প্রশিক্ষণে মাসউদ আযহারের মাটির শরীর যেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ হয়ে গেলো। এরপর পাল্টে গেলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। শিক্ষকতায়, ইবাদত, বক্তৃতা, রচনা ইত্যাদিতে তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আর কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। এমন অবস্থায় সর্বমোট তিনি জামেয়া উলুমে ইসলামিয়ায় দু'বছর শিক্ষকতা করেন। করাচীর দিল্লী কলোনী মসজিদে জুম্মার খুৎবাহসহ সপ্তাহে তিনি আরো দু'টি প্রশিক্ষণ সভা করতেন। এর মধ্যে একটি ছিলো শুধু মহিলাদের জন্য। ইতিপূর্বে তাঁর মজলিসগুলোতে ঈমান, আত্মশুদ্ধি ও সুফিয়ানা কথার গুরুত্ব ছিলো বেশি। কিন্তু আফগান থেকে ফিরে ঐ সবের সাথে সাথে শুধু জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্ব বর্ণনা করতে শুরু করেন। না শুধু মুখ দিয়ে বললেই চলবে না। জিহাদের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রচারের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। তাই তিনি ১৯৯০ সনে 'সদা এ মুজাহিদ' (মুজাহিদদের আওয়াজ) নামের পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত হরকতুল মুজাহিদিনের মাসিক পত্রিকা 'সদা এ মুজাহিদ' নিয়মতান্ত্রিক হয়ে গেলো। পরবর্তীতে তা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষকতা জীবনে মাওলানা মাসউদ আযহারের প্রতিদিনের রুটিন ছিল সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত মাদ্রাসার বিদেশী ছাত্রদেরকে আরবী শিক্ষাদান, বাদজোহর থেকে আসর পর্যন্ত মাদ্রাসার বিভিন্ন কাজ সম্পাদন, বাদআসর থেকে রাত্রের অধিকাংশ সময় তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর এখলাসিয়ত-লিল্লাহিয়ত ও জিহাদী অনুপ্রেরণা গোটা পাকিস্তানে তাঁকে মকবুল করে দিয়েছিল। আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদ কমান্ডার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জিহাদের প্রচার, মুজাহিদদের সহযোগিতা ইত্যাদি যদিও জিহাদের সমমর্যাদা রাখে কিন্তু ময়দানে গিয়ে জিহাদ করায় মজা অন্য রকম। যে তাঁর জীবনকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য সত্যিই উৎসর্গ করে দিয়েছে, ময়দানে শত্রুর সামনাসামনি না হওয়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসতে পারে না। মাওলানা মাসউদ আযহারের অবস্থাও হলো তাই। তাই তিনি চলে গেলেন আফগানিস্তান। বারবার তিনি ফ্রন্টলাইনে রুশবাহিনীর সাথে লড়াই করেছেন।

রুশ বাহিনীর বারুদের আঘাতে তার বাম পা গুরুতর জখম হয়। দীর্ঘ বিশ দিন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। এরপরও ঘরে বসে থাকেননি। আফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তিনি সেখানে ফ্রন্টলাইনেই ছিলেন। আফগান স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর মাথায় কাশ্মীরের চিন্তা শুরু হলো, শুধু কাশ্মির নয় বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জন্য তিনি জীবনকে উৎসর্গ করে দিলেন। ইতিমধ্যে হরকতুল মুজাহিদিন নাম পরিবর্তন করে হরকতুল আনসার রাখা হলো। তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দাওয়াত নিয়ে পাকিস্তানের সকল প্রদেশসহ আরব বিশ্ব, আফ্রিকা, ইউরোপ সফর করেন। মাওলানা মাসউদ আযহার তথাকথিত মাওলানা-মৌলভী কিংবা ইসলামী বিপ্লবের মুখোশধারী যারা জিহাদে না যাওয়ার বিভিন্ন অজুহাত তৈরী করে শুধু শুধু দাওয়াত খেয়ে নিজেদের ভূঁড়ি মোটা করেন, মিষ্টি মিষ্টি সুন্নতের কথা বলে গলাবাজী করেন, জিহাদকে বাদ দিয়ে কৌশল অবলম্বনের নামে কোরআনের অপব্যাখ্যা করেন, তাদের কট্টর সমালোচক। যারা কিতাল ফি সাবিলিল্লাকে বাদ দিয়ে জিহাদের কথা বলে তাঁর মতে ওরা ইসলাম এবং মুসলমানের শত্রু। তাঁর মতে, জিহাদের মূল অর্থই হচ্ছে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। আজ মুসলমানদের মধ্যে এর আমল না থাকায় গোটা বিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত। তিনি আরো বলেন, মূর্খতাবশত কিংবা প্রাণের ভয়ে আমাদের তাবলিগ জামাতের কিছু ভাই জিহাদের বিরোধীতা করেন, অথচ তাবলীগি নেসাব বা ফাজায়েলে আমলের বেশিরভাগ অধ্যায়ই শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (র.) জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। মাওলানা মাসউদ আযহারের কোরআন, হাদিস, ইতিহাসকেন্দ্রিক এবং বর্তমান অবস্থার আলোকে বক্তব্যগুলো সত্যই মুসলিম যুবকদের ঘুমেরনেশা ভেঙ্গে দিয়েছে। মাওলানা মাসউদ আযহার যেমন সুবক্তা তেমনি উর্দু সাহিত্যের একজন উন্নতমানের সাহিত্যিক। উর্দু ভাষায় তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ ইংরেজী, বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিতও হয়েছে। 'মাসিক সদা-এ-মুজাহিদ' তাঁরই সম্পাদনায় পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসারিত হয়েছিলো।

মাওলানা মাসউদ আজহারের সাহিত্য ও বক্তব্যে যেমন স্থান পেয়েছে জিহাদ, কিতাল ও মজলুম মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা তেমনি পেয়েছে সুন্নতের আনুগত্য, আল্লাহর ইবাদত, রাসুল (সা.) এর ভালোবাসা, নিজেদের পাপের উপর চিন্তা এবং সংশোধনের পথ, আমলের অনুপ্রেরণা, মানব সেবা, আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ভরসা ইত্যাদি বিষয়ও। মাওলানা মাসউদ আযহারের স্পর্শ যেখানেই লেগেছে সেখানেই জিহাদের জয়ধ্বনি

শুরু হয়ে গেছে। তাঁর সংস্পর্শে ইতিমধ্যে ভারতের জেলেও জিহাদের কাজ শুরু হয়েগিয়েছিলো। ভারত সরকার কর্তৃক জেলে মাওলানা মাসউদ আযহারের উপর এত নির্যাতন হওয়ার পরও তিনি অটল থেকেছেন তাঁর নিজের বিশ্বাসের উপর। নির্যাতন আর মৃত্যুর ভয়ে এখনো তিনি মাথানত করেননি। জেল থেকে তিনি ভারত সরকারের প্রতি হুশিয়ারী জানিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা! মুজাহিদদেরকে দূর্বল মনে করো না, যদি তোমরা একটি গুলি চালাও মুসলমানদের উপর তবে মুজাহিদরা এর উত্তর রকেট লাঞ্চারের মাধ্যমে দেবে'। ১৯৯৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী দুপুর সাড়ে বারোটায় মাওলানা মাসউদ আযহারকে ভারত সরকার বন্দী করেছে সত্য, কিন্তু বন্দী করতে পারেনি তাঁর জিহাদী কাফেলা এবং হাজার হাজার ক্যাসেট। বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ তাঁর ক্যাসেট,বই এবং বক্তব্যের মাধ্যমে মাসউদ আযহার বেড়েই চলছে। মাওলানা মাসউদ আযহার প্রথমে ছিলেন কাশ্মীর জেলে, পরবর্তীতে দিল্লীর তেহার জেলে। অতঃপর ছয় বছর ছব্বিশ দিন পর কয়েকজন যুবক অলৌকিক বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে তাকে ভারতের জেল থেকে মুক্ত করেন। আমেরিকার নির্দেশে পাকিস্তানের মুশারফ সরকার তাকে বেশ কয়েকবার বন্দী করলেও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের মুখে আটকিয়ে রাখতে পরেনি। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানেই আছেন। তবে স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের কাছে কিছুটা গৃহবন্দীর মতো আছেন।

("ভারতের জেল থেকে মুজাহিদ কমান্ডার মাসউদ আজহারের কণ্ঠ" শিরোনামে ১৯৯৬ ইংরেজীর ২৭ নভেম্বর ৩ ডিসেম্বর সংখ্যা সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানে আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখন মাওলানা মাসউদ আযহার ভারতের জেলে বন্দী ছিলেন। সময়ের ব্যবধানে কিছুটা পরিবর্তন করে তা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হলো। অনুবাদক)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشدتنكيلا. (النساء: ٨٤)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقى الله بغير اثر الجهاد لقى الله وفيه ثلمه. (ترمذى: ج ١ ص ٢٠٠)

যে কাজের সম্পর্ক পবিত্র কোরআনের সাথে, যে কাজের নির্দেশ এসেছে স্বয়ং মহানবী (স.) এর কাছ থেকে, তা বুঝা এবং মান্য করার ব্যাপারে মুসলমানদের একটুও গাফেল হওয়া উচিৎ নয়। ইসলামে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে প্রচুর আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রচুর হাদিসও রয়েছে। তাছাড়া স্বয়ং মহানবী (স.) নিজেও জিহাদে অংশ নিয়েছেন । তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অত্যন্ত।

সাহাবায়ে কেরামদের কাছে জিহাদের গুরুত্ব :

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গণ যখন সংবাদ পেতেন যে, অমুক স্থানে জিহাদ চলছে, সাথে সাথে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত ও শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশ্যে। হযরত আবু মুসা আস'য়ারী (রা.) একদিন এক বৈঠকে হাদিস বর্ণনা কালে বলেন যে-

اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف

তোমাদের জানা উচিৎ যে, বেহেস্ত তলোয়ারের ছায়ার নীচে।

(বোখারী-প্রথম খন্ড)

এই বৈঠকের শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাস করলো, হে আবু মুসা! আপনি স্বয়ং ওই হাদিস মহানবী (স.) এর কাছ থেকে শোনেছেন কি?

হযরত আবু মুসা আস্'য়ারী (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজে শোনেছি।

প্রশ্নকর্তা বললো, আমার জন্য এতটুকু শোনাই যথেষ্ট। আমি বুঝতে পেরেছি মহানবী (স.) এর উদ্দেশ্য।

সে দ্রুত বৈঠক থেকে উঠে জিহাদের ময়দানে চলে গেলো। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)দের বর্ণনানুসারে- ঐ ব্যক্তি আর জিহাদ থেকে ফিরে আসেনি। তার প্রাণহীন শরীর এসেছে। সে জিহাদ করতে করতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। মুহাদ্দিসগণ تحت ظلال السيوف তলোয়ারের ছায়ার নীচে'র ব্যখ্যায় বলেছেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যুদ্ধের চরমাবস্থায় অংশগ্রহণ। কারণ সেখানে তলোয়ার দিয়ে যখন ঘাত-প্রতিঘাত করা হয় তখন বেহেস্ত এবং দোজখের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয়। মুসলমানদের উপর তলোয়ার লেগে যদি শহীদ হয়ে যায় তবে সোজা বেহেস্তে চলে যাবে। আর কাফেরদের উপর যদি তলোয়ার লেগে মারা যায় তবে সোজা দোজখে চলে যাবে।

একটি হাদিস শোনার সাথে সাথে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)দের অবস্থা এমন হতো যে, যতক্ষণ প্রাণ থাকতো ততক্ষণ লড়াই করতেন। কারণ তাদের উদ্দেশ্য দুনিয়া ছিলো না। কোন কোন সাহাবা (রা.) এর ঘটনা এমন যে, ঈমান গ্রহনের সাথে সাথে জিহাদের ময়াদানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। ওদের সম্পর্ক মহানবী (স.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, "সামান্য আমলে ওরা বেশি প্রতিফল উপার্জন করে নিয়েছে"।

"জামেউল ফাওয়াইদ" গ্রন্থে এসেছে যে, এক জিহাদের ময়দানে কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ করলো; কেউ আছো কি মুসলমানদের পক্ষে আমার সাথে লড়াই করবে? তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি অগ্রসর হলেন, উভয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। কাফির লোকটি শক্তিশালী ছিলো এবং মুসলমান ব্যক্তিকে শহীদ করে দিলো। অগ্রসর হলেন দ্বিতীয় মুসলমান। কিন্তু তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর এই কাফির ব্যক্তি ঘোড়া চালিয়ে মহানবী (স.) এর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলো, আপনি কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করেন? মহানবী (স.) উত্তরে বললেন, "আমি এজন্য লড়াই করি যাতে বিশ্বব্যাপী আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকে।"

কাফের লোকটি বললো, এটা তো অনেক উত্তম আহবান। আমি কি তা গ্রহণ করতে পারবো?

মহানবী (স.) বললেন, হ্যাঁ, গ্রহণ করতে পারবে। সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে ঘোড়া নিয়ে আবার কাফেরদের দিকে চলে গেলো। তবে

এবার কাফেরদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এই নও মুসলিম এক সময় শহীদ হয়ে গেলেন। কিছু সময় আগে যে ঈমানদারদের প্রতি আক্রমণ করছিলো, কিছু সময় পর সে ঈমান বুকে নিয়ে শহীদ হয়ে গেলো। মহানবী (স.) তাঁকে উঠালেন এবং বাকী দুই সাহাবী (রা.) এর পাশে দাফন করে দিলেন, যাদেরকে ঐ ব্যক্তি শহীদ করেছিলো ঈমান গ্রহণ করার পূর্বে। মহানবী (স.) বললেন,"কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের হৃদয়ে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। ঐ ব্যক্তি সিজদা কিংবা নামাজের কোন সময় পায়নি। কিন্তু জিহাদের আমল তাকে কোথায় থেকে কোথায় পৌছিয়ে দিয়েছে। হযরত ইমাম বোখারী (র.) এ রকম একটি বর্ণনা করেছেন তাঁর কিতাবুল জিহাদে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এক জিহাদে সাহাবায়ে কেরাম যাচ্ছেন। এমন সময় এক নজদী আরবী তাদের কাছে এসে জানতে চাইলো ; তোমরা কোথায় যাচ্ছো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা জিহাদে যাচ্ছি। আমাদের সাথে আমাদের নবী (স.) রয়েছেন। সে জানতে চাইলো; কোন গণিমত পাওয়া যাবে কি? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন; হ্যাঁ। পাওয়া যাবে। তবে বিজয় হলে গণিমত পাওয়া যায়।

সে ব্যক্তি গণিমতের লোভে জিহাদে শরিক হয়ে গেলো। কিন্তু জিহাদের ময়দানে এমন কিছু দৃষ্টিতে আসে যাতে বড় বড় কাফেরদেরও মন পরিবর্তন হয়ে যায়। আলাহামদুলিল্লাহ! আফগান জিহাদে আমি নিজে এমন অনেক কিছু দেখেছি। এটাতো পনেরো শ বছর পরের অবস্থা। বর্তমান সময়ে যদি এমন বিস্ময়কর অবস্থা দৃষ্টিতে আসে তবে যে সব জিহাদে স্বয়ং মহানবী (স.) উপস্থিত ছিলেন সেগুলোর অবস্থা কি ছিলো? আফগান জিহাদে যখন আমার সাথীরা ময়দানের দিকে যেতেন তখন প্রচুর অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্টিতে আসতো। আমরা যখন ক্যাম্পে কেউ সেজদায়, কেউ তেলাওয়াতে, কেউ প্রার্থনায় শাহাদতের জন্য কাঁদছি তখন আমীর সাহেবের নির্দেশ- অমুক অমুক ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আমীর সাহেব যাদের নাম বলছেন তাদের চেহারায় আনন্দের ছাপ স্পষ্ট। যাদের নাম বলা হয়নি তারা দুঃখিত। যে সকল সৌভাগ্যবানের নাম বলা হয়েছে তারা কালাসনিকুফ কাঁধে উঠিয়ে, কোমরে বুলেটের বেল্ট লাগিয়ে প্রস্তুত। তাদের চেহারায় আশ্চর্যজনক খুশির ছাপ। যাদের নাম আসেনি তারা যাত্রীদের জিনিষপত্র তৈরি করে দিচ্ছেন। কেউ কেউ তাদের কানের কাছে গিয়ে বলছেন, 'আল্লাহর হুকুমে যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তবে কিয়ামতের দিন আমাকে ভুলে যেও না। আমার চেহারা দেখে নাও যাতে আমাকে চিনে সুপারিশ করতে পার। ওরা কেউ কেউ

আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে বলছেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাহায্য কর। আবার কেউ সাথীদের সাথে হেসে হেসে গল্পও করছেন। নির্দেশ হওয়ার সাথে সাথে "নারায়ে তাকবির- আল্লাহু আকবার" শ্লোগান দিয়ে মুজাহিদদের যাত্রা শুরু হয়ে গেলো। যারা যাচ্ছেন তাদেরকে দেখে-ই বুঝা যাচ্ছে যে, তারা গর্ব ও দৃঢ়তা অনুভব করছেন। শত্রুপক্ষ থেকে ধারাবাহিক বুলেট-বোমা বর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু তারা এসবের গুরুত্ব-ই দিচ্ছেন না। ভয়ে নয় বরং সুন্নতে রাসুল (স.) হিসাবে সবার মুখে-

حسبنا الله ونعم الوكيل

হাসবুনাল্লাহা 'ওয়ানি'মাল ওয়াকিল

অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদের হেফাজতকারী।

এভাবে প্রায়-ই দেখা গেছে যে, সাথীরা যাচ্ছেন। তাদের হৃদয়ে ঈমানের নূর, মুখে জিকরুল্লাহ। হৃদয়ে শাহাদতের নেশা। একে অন্য থেকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের চেষ্টা করছেন। শত্রুর গুলি বর্ষণ মোকাবেলা করে বেপরোয়া এলাকার পর এলাকা বিজয় করে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। এ রকম দৃশ্যপট হয় যে, দুনিয়ায় যেন ওদের জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুতে স্বাদ অনুভব হয় না।

আমাদের এক বড় মুফতি সাহেব জিহাদে গিয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। মাঝে মধ্যে মোকাবেলায়ও গিয়েছেন। তিনি শত্রুর দিকে গুলি বর্ষণ করার পর শত্রু যখন পাল্টা গুলি বর্ষণ করলো তখন তিনি বলতে লাগলেন; আমি বিশ বছর থেকে বায়তুল্লাহ তোয়াফে যাই। কিন্তু কখনো এত স্বাদ অনুভব করিনি যতটুকু এই এক মিনিটে পেলাম। এটা মুফতি সাহবের কোন অতিশয়োক্তি ছিলো না। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুমায়রা (রা.) বলেন যে, "আমি মনে করি শবে কদরে হজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে এবাদত করার চাইতে বেশি উত্তম কোন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের পাহারাদার হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা। কারণ হাদিসের মধ্যে এসেছে যে, আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা শবে কদরে হজরে আসওয়াদের সামনে সমস্ত রাত এবাদত থেকে উত্তম। (কানজুল আমাল-কিতাবুল জিহাদ)। আমাদের এক সাথী আখতার মাহমুদ শহীদ (র.) মাত্র বিশ বছরের যুবক ছিলেন। যখন করাচী থেকে রওয়ানা দিয়েছি তখন তার চেহারায় শাহাদতের নূর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যখন গরদিজের যুদ্ধে যাচ্ছিলো তখন একই অবস্থা। সাথীরা তাকে বলছিলো; ভাই আখতার! যদি শহীদ হয়ে যাও তবে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।" উত্তরে সে বললো,

“আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিশ করবো যে আজীবন জিহাদের ময়দানে থাকে।” একদিন প্রচণ্ড বরফ বর্ষিত শীতের সকালে আখতার মাহমুদ গোসল করছে। সাথীরা জানতে চাইলো; এই প্রচণ্ড শীতে গোসলের কি প্রয়োজন? উত্তরে সে বললো; “মনে হচ্ছে আগামী কাল আমার মৃত বিবাহ”। পরের দিন শত্রুদের এক প্রচণ্ড আক্রমণে আখতার মাহমুদের বুকে গুলিবিদ্ধ হলো। হাসতে হাসতে সে শহীদ হয়ে গেলো। শাহাদতের মহরানা দিয়ে ৭২ জন নূরের সাথে তাঁর বিবাহ্ হয়ে গেলো।

যাই হোক, আমি বলতে ছিলাম যে, সাহাবায়ে কেরামদের সাথে ঐ নজদী আরবী গণিমতের নিয়তে জিহাদের ময়দানে গিয়েছিলো। যাওয়ার পথে সে কিছু অদ্ভুত ঘটনা দেখে ভাবতে ভাবতে কিংকর্তব্যকিমূঢ় হয়ে গেলো। তখন তার হৃদয়ে ঈমানের বাতি জ্বলে উঠলো এবং এক সময় মুসলমান হয়ে গেলো। মুসলমান হওয়ার পর তার ইচ্ছে হলো সর্বক্ষণ মহানবী (স.) এর নিকটে নিকটে থাকতে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তার মুসলমান হওয়ার সংবাদ না জানার কারণে তাকে মহানবী (স.) এর নিকটে যেতে দিচ্ছেন না। ওহী প্রাপক নবী অবগত হয়ে গেছেন যে, সেই ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের কথা, তিনি বললেন, “তাকে আমার কাছে আসতে দাও। সে বেহেস্তের রাজাদের একজন।” অতঃপর ঐ ব্যক্তি কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে গুরুতর আহত হয়ে গেলো। মহানবী (স.) হযরত সাহাবা কেরাম (রা.)দেরকে বললেন, ‘ওকে দেখে এসো।’ তারা দেখলেন সে মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন কোন সাহাবী চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, একজন কাফের মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে আহত হয়ে গেলো। মরে যদি তবে ঈমান ছাড়াই মরবে। কেউ কেউ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস করলেন, হে ভাই! তুমি জাতীয়তাবাদের লোভে না গণিমতের লোভে লড়ছিলে?

সে বললো, “আল্লাহর কসম, আমি শুধু আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি।” এতটুকু বলার সাথে সাথে লোকটি শহীদ হয়ে গেলো। হযরত মহানবী (স.) নিজের হাতে ঐ ব্যক্তির লাশ কবরে রাখলেন এবং তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে মহানবী (স.) মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)গণ চিন্তিত হয়ে মহানবী (স.) এর কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.)! আপনি এমন কি দেখলেন যার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মহানবী (স.) বললেন যে, তার হুরগণ এসে গেছেন।

(আত-তারগীব ওয়াত তারবীব, কিতাবুল জিহাদ)

জিহাদ এত বড় এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত যে, এই মাত্র মুসলমান হয়ে কোন আমল না করে শুধু শাহাদতের বিনিময় এত বড় দরজা পেয়ে গেলো। এর দ্বারা-ই প্রমাণ হয় জিহাদ কত বড় আমল। মুসলমানদের বুঝা উচিৎ যে, জিহাদের বিফলতার কোন চিহ্ন নেই।

فيقتلون ويقتلون

জিহাদের ময়দানে কাউকে কতল করলেও সফল হবে এবং তোমাকে কেউ কতল করলেও সফল হবে। যদি শত্রুর গুলির আঘাতে প্রাণ যায় তবে তো শহীদ-ই এবং যদি নিজের কোন সাথীর ভুলক্রমে আঘাত লেগে প্রাণ চলে যায় তবু শহীদ।

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব :

এক সাহাবী বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। তার মা মহানবী (স.) এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, হে রাসূল (স.)! আমার ছেলে কি শহীদ হয়েছে? কারণ তার উপর (واصابه سهم عرب) এই রকম তীর লেগেছে যা কোন দিক থেকে এসেছে বুঝা যাচ্ছে না। তাই সন্দেহ হচ্ছে তা কোন কাফেরের দিকে থেকে এসেছে না ভুলক্রমে কোন মুসলমান সাথীর কাছ থেকে এসেছে। যদি আমার ছেলে জান্নাতবাসী হয় তবে আমি ধৈর্যধারণ করবো, নতুবা কাঁদবো। মহানবী (স.) বললেন, কি বলছো? জান্নাতে তার জন্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান রয়েছে।

وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى

তোমার ছেলেতো জান্নাতুল ফেরদৌসের মধ্যে রয়েছে।

(বোখারী প্রথম খণ্ড)

খয়বরের যুদ্ধ সম্পর্কে এক সাহাবীর ভাষ্য হলো যে, আমার মামা এক ইহুদীর সাথে লড়াই করছিলেন। তার তলোয়ার ছোট ছিলো। (আপনারা হয়তো জানেন যে, তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার সময় এক পা সামনে এবং এক পা পিছনে থাকে।) তিনি যখন পজিশন নিয়ে ইহুদীর উপর আঘাত করতে চাইলেন তখন ইহুদী লোকটি আত্মরক্ষা করে নিলো। ফলে আঘাত নিজের শরীরে লেগে গেলো এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, “দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নিজের আঘাতে মারা গেছেন। যদি কাফেরদের আঘাতে মারা যেতেন তবে শাহাদতের মর্যাদা পেতেন।” এসব কথা শোনে আমার খুব দুঃখ হলো। আমি মহানবী (স.) এর কাছে গিয়ে বললাম, হে রাসূল (স.)! লোকে আমার মামা সম্পর্কে এসব কি বলছে? এই অবস্থায় আমার মামা কি শহীদ হবেন?

মহানবী (স.) বললেন, "সাধারণ শহীদ থেকে তোমার মামার দ্বিগুণ ছোয়াব হবে। প্রথমত শাহাদতের ছোয়াব, দ্বিতীয়ত মানুষ যে তার সমালোচনা করছে সেই জন্য এবং এটাও এক শহীদের ছোয়াব।"

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) এর পিতা ছয়জন যুবতী মেয়ে ও বেশ কিছু ঋণ থাকার পরও জিহাদে চলে গেলেন। পিতার শাহাদতের পর হযরত যাবের (রা.) মহানবী (স.) এর কাছে এসে বললেন, হে রাসূল (স.)! আমার পিতা এই অবস্থায় শহীদ হয়ে গেছেন, তার সম্পর্কে কিছু বলুন। মহানবী (স.) বললেন, তোমার পিতার অবস্থা এই রকম যে, আল্লাহ পাক এখন পর্যন্ত কারো সাথে সামনা-সামনি কথা বলেননি, وكلم اباك كفاحا কিন্তু তোমার পিতার সামনা সামনি কথা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাস করলেন; কোন চাহিদা আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন; হে আল্লাহ! আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন যাতে আমি গিয়ে মুসলমানদেরকে বলতে পারি শাহাদতের মৃত্যুতে কত স্বাদ ও আনন্দ। আল্লাহ বললেন- سبق منى انهم لا يرجعون সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আর দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারবে না।

শাহাদতের আনন্দ :

শাহাদতের সময় কোন মুজাহিদকে হতাশ হতে দেখি নাই। বরং আমার দেখা মতো যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সবার চেহারা হাস্যোজ্বল ছিলো। এক মুজাহিদ আহত হলেন। অন্য কিছু সাথী তাকে উঠিয়ে বললেন, কিছু উপদেশ করুন। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আমার উপদেশ হলো তোমরা কখনো জিহাদ ত্যাগ করবে না।" জালালাবাদের যুদ্ধে এক আরব মুজাহিদ আহত হলেন। তিনি সকল সাথীকে বললেন, তোমরা দ্রুত আমার কাছে এসো। সবাই আসার পর তিনি বললেন, আমি দোয়া করবো তোমরা আমীন বলবে। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথীদেরকেও এমন মৃত্যু দাও যা এই মুহূর্তে আমাকে দিচ্ছো।" সবাই আমীন বললেন। সাথে সাথে আরব মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ জানেন যে, এই মুজাহিদ শাহাদতের সময় কি আনন্দ উপভোগ করছিলেন যা তার সাথীদের জন্যও কামনা করে গেলেন। শাহাদতের মৃত্যু এত আনন্দের যে শহীদগণ জান্নাতে গিয়েও সে আনন্দ ভুলতে পারবে না। তাই আল্লাহর কাছে এমন প্রার্থনা করবেন যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বারবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও যাতে বারবার শহীদ হতে পারি। স্বয়ং মহানবী (স.) নিজেও এই দোয়া করতেন। অনেক বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (স.) দোয়া করতেন-

হে আল্লাহ্! আমার তামান্না তোমার রাস্তায় আমাকে শহীদ কর, এরপর জীবন দাও, এরপর আবার শহীদ কর। এভাবে বার বার জীবন দিয়ে শহীদ কর।

জিহাদ বিমুখতা :

জিহাদ সম্পর্কে আলোচনায় তিনটি কথা সাধারণত আমি বলে থাকি, এবং তা হলো এক; জিহাদের ফজিলত, দুই; জিহাদ করা ফরজ, তিন; জিহাদ করা ওয়াজিব। আজ ময়দান ছেড়ে বিশ্বব্যাপী আমাকে যেতে হচ্ছে জিহাদের ফজিলত-ফরজিয়ত কিংবা জরুরীয়ত বলার জন্য নয়, বরং যেতে হচ্ছে- জিহাদ কাকে বলে সেই কথা বলার জন্য। আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলমানদের একথা জানা নেই যে, জিহাদ কাকে বলে, অথচ জিহাদ এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ যা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির লিখেছেন যে, কোরআনের লক্ষ্য-ই হলো জিহাদ। কেউ কেউ বলেছেন যে, তৌহিদের পর যে বিষয় সবচাইতে বেশি কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে, তা জিহাদ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মতের বাচ্চাগণও একথাটা বুঝতো। তারা নিজে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.) এর কাছে অনুরোধ করতো জিহাদে যাওয়ার জন্য। এমন কি তারা নিজেরা প্রতিযোগিতা হিসাবে কুস্তি পর্যন্ত করতো, অথচ আজ একথাটি উম্মতের যুবকদেরও বুঝে আসছে না। যে বিষয়টা উম্মতের মহিলারা তৎকালীন সময় বুঝতো, তা আজ উম্মতের পুরুষেরা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। হযরত খাওলা (রা.) শাম বিজয়ের সময় এক ময়দানে বড় বড় তিনটি কাফের কামান্ডারকে কতল করেছিলেন। আজ উম্মতের পুরুষদেরকে, যুবকদেরকে বুঝাতে হয়- জিহাদের অর্থ কি? জিহাদ কাকে বলে? কিতাল কাকে বলে? আজ সবাই স্বঘোষিত মুজাহিদ। যে দু'এক কথা বক্তব্য দিতে পারেন তিনিও মনে মনে মুজাহিদ। যিনি দু'কলম লিখে ফেলেছেন তিনিও মনে মনে মুজাহিদ। যে ট্যাক্সি চালায় সেও বলে এটাও যে একটা জিহাদ। যে বাচ্চা রক্ষণাবেক্ষণ করে সেও বলে জিহাদে আছি। বুঝে আসে না আজ গোটা উম্মত জিহাদে থাকার পরও উম্মতের উপর এত জুলুম, অত্যাচার এবং অপমান আসে কিভাবে? জিহাদের সাথে তো ইজ্জতের সম্পর্ক। জিহাদের মাধ্যমে তো উম্মতের ইজ্জত, সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চারিদিকে শুধু মুজাহিদ আর মুজাহিদ থাকার পরও উম্মত আজ এত অপমানিত, মুসলমানদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, পবিত্র কোরআনকে অপমান করার জন্য জ্বালানো কিংবা মলমূত্র পরিস্কারের জন্য ব্যবহার করছে, (বাবরী মসজিদ শহীদ করা হয়েছে) মসজিদে আকসা ইহুদীদের দখলে।

বুঝে আসে না যে, যারা নিজেদেরকে মুজাহিদদের থেকে একটু নিচে স্থান দিতে প্রস্তুত নয়, যারা নিজের ঘরের মাটিকেও জিহাদের ময়দান মনে করছেন, যারা ঘরের চেয়ারে বসাকেও জিহাদের সমান ফজিলত মনে করছেন,তাদের জিহাদগুলো কি ধরণের জিহাদ?

হে আমার প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! মহান আল্লাহ্ পাক যে এবাদতের নাম যা রেখেছেন তা সেই এবাদতের জন্য-ই ব্যবহৃত হয়। উত্তমরূপে জানা উচিত যে, জিহাদের মস'আলা বুঝাই ঈমানকে বুঝা। কারণ; ফেকাহের কিতাবসমূহে বলা হয়েছে, জিহাদ অস্বীকার যে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। সামান্য একটি সুন্নতকে নিয়ে যদি কেউ তামাসা করে তবে তার ঈমান পূর্ণ থাকবে না। মিসওয়াক কি? এই কথা যদি কেউ অবজ্ঞার সাথে বলে তবে তার ঈমান সন্দেহের মধ্যে বুঝতে হবে। এখন চিন্তা করুন; যে ব্যক্তি ফরজ জিহাদ সম্পর্কে অবজ্ঞা করে তার ঈমান কোথায় রইলো? উলামাদেরকে জিজ্ঞাস করুন যে, জিহাদ এত বড় ও উন্নত ফরজ যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে-ই এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য :

আপনি কোরআনকে জিহাদ সম্পর্কিত ছোট বড় যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করুন, সে আপনার উত্তর দিবে। আপনি যদি কোরআনকে জিজ্ঞাস করেন- হে কোরআন! আমাকে বলে দাও জিহাদের হুকুম কি?

কোরআনে পাক উত্তর দিবে- كتب عليكم القتال তোমার উপর জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। (সুরা বাকারা-২১৬)

যদি জিজ্ঞাস করেন, হে কোরআন! আমরা জিহাদ করলে আল্লাহর কাছ থেকে কি পাবো?

কোরআনে পাক বলবে- ان الله يحب الذين যারা আল্লাহর রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। (সুরা সফ-৪)

যদি জিজ্ঞাস করেন, হে কোরআন! বলে দাও আমাদের কতদিন লড়াই করতে হবে?

কোরআন বলবে- وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله

যতদিন দুনিয়ায় ফিৎনা ফ্যাসাদ এবং কুফরী শক্তিশালী থাকবে ততোদিন তোমাদের লড়াই করতে হবে। (সুরা আনফাল-৩৯)

যদি জিজ্ঞাস করেন যে, এই লড়াই করে লাভ কি হবে?

সে উত্তরে বলবে-এতে তোমাদের কম পক্ষে ছয়টি উপকার হবে।

যথা-এক قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم

অতীতে যে কাজ মহান আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে করাতেন আজ তা তোমাদের মাধ্যমে করাতে চাচ্ছেন। অতীতে দ্বীনের শত্রুদেরকে হযরত জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হতো, আজ তোমাদের হাতের মাধ্যমে দিতে চাচ্ছেন।

দুই- ويخزهم

আল্লাহ পাক জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে অপমানিত করে দিবেন। তাদের পরিচিতি এবং সংস্কৃতি কিছুই নিজস্ব থাকবে না। তারা দুনিয়ায় অপমানিত এবং অশান্তিতে থাকবে।

তিন- ويشف صدور قوم مؤمنين

তোমাদের মন শান্তনা পাবে। আজ যে সকল মুসলমান কাঁদছে- যেমন, বোসনিয়ায় মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত ধ্বংস করা হয়েছে, কাশ্মীরে এখনো ধ্বংস লীলা চলছে, বাবরী মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, জেরুজালেমে মসজিদুল আকসা ইহুদীদের দখলে। জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মনে শান্তনা পাবে।

চার- ويذهب غيظ قلوبهم

জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের মনের রাগ ও হিংসা কাফেরদের উপর মিটে যাবে। ফলে তোমাদের নিজেদের মধ্যে আর কোন রাগ বা হিংসা থাকবে না। আর তোমরা নিজেরা একে অন্যের ভাই হয়ে যাবে।

পাঁচ- وينصركم عليهم

আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন এবং তিনি সাহায্য করবেন বাতাস, ফেরেস্তা ইত্যাদিসহ প্রত্যেক জিনিষের মাধ্যমে।

ছয়- ويتوب الله على من يشاء

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে অনেককে ক্ষমা করে দিবেন। হে কোরআন! তুমি বলো, জিহাদে গেলে অন্য মানুষের সামনে আমাদের ইজ্জত কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?

পবিত্র কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে-

فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما

তোমাকে গোটা উম্মতের উপর সম্মানিত করা হবে।

হে কোরআন! এর প্রমাণ কি?

উত্তরে কোরআন বলছে- والعاديات ضبحا فالموريات قدحا

এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহ পাক মুজাহিদদের ঘোড়ার কসম করেছেন।

হে কোরআন! বলে দাও আমরা প্রথম কার সাথে জিহাদ করবো? কোরআন বলছে- فقاتلوا اولياء الشيطن .... فقاتلوا ائمة الكفر

শয়তানের দালালদের সাথে লড়াই কর এবং কাফেরদের বড় বড় নেতাদেরকে কতল কর।

হে কোরআন! তুমি আমাকে বলে দাও আমি ময়দানে গিয়ে কি ভাবে লড়াই শুরু করবো?

কোরআন বলছে- اذا لقيتم فئة فاثبتوا

দৃঢ়তার সাথে লড়াই কর।

হে কোরআন! তুমি আমায় বলে দাও আমি কিভাবে দৃঢ় থাকবো যেখানে চারিদিক থেকে গুলি বর্ষণ হচ্ছে, উপর থেকে বোমা নিক্ষেপ হচ্ছে এবং নীচ থেকে মাইন ফাটছে?

কোরআন বলছে- فاذكروا الله

এমন সংকটময় অবস্থায় আল্লাহকে ডাকবে। উপর, নীচ, এবং চারিদিকের সকল প্রস্তুতিকে আল্লাহ্ প্রতিহত করবেন।

হে কোরআন! তুমি বলে দাও যদি জিহাদের ময়দানে মৃত্যু আসে তবে কি মরে যাবো এবং মানুষ কি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তি বলবে?

কোরআন বলছে, আমি মানুষদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি এই বলে যে,

ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله امواتا

হে মানুষগণ! আমার রাস্তায় যারা শহীদ হয় তাদেরকে মৃত বলো না। হে কোরআন! মৃততো বলবে না। কিন্তু মৃত হিসাবে তো ধারণা করবে? কোরআন বলছে, আমি এই ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা লাগিয়ে দিয়েছি-

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا

আমার রাস্তায় শাহাদতবরণকারীকে মৃত বলে ধারণা করো না।

হে কোরআন! শাহাদতের পর কি আমাদের আমল বন্ধ হয়ে যাবে?

কোরআন বলছে, কে বলছে বন্ধ হয়ে যাবে?

والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم

যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে তার আমল বন্ধ হবে না।

হে কোরআন আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে?

কোরআন বলছে; না। الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما

তোমরা জিহাদ না করলেও জিহাদ বন্ধ হবে না, তবে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এই শাস্তির স্বরূপ এই রকম-

ويستبدل قوما غيركم

তোমাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন জিহাদের জন্য।

হে কোরআন!ঐ জাতির বৈশিষ্ট কি হবে?

কোরআনের উত্তর হবে, اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين

তারা ঈমানদারদের সামনে বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের সামনে শক্ত থাকবে।

হে কোরআন! তুমি আমায় বলো যে, নবী ও রাসুল (আ.) গণও কি জিহাদ করেছেন।

কোরআন বলছে- وقتل داؤد جالوت দাউদ (আ.) জালুতকে কতল করেছেন।

হে কোরআন! তুমি বলে দাও জিহাদ কোন প্রকারের লোকের কাজ, এবং পীর, বুজুর্গ, ওলীদের উপর কি জিহাদ ফরজ?

কোরআন বলছে وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير

নবীদের সাথে মিলে কত বড় বড় দরবেশগণও জিহাদ করেছেন। তারা কোনদিন কাফেরদের সামনে মাথানত করেননি। তারা ক্রমাগত জিহাদ করেছেন।

হে কোরআন! তোমার প্রতিটি কথা সত্য, কিন্তু জিহাদে যেতে চাইলে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা যেতে দেন না, আম্মা প্রতিরোধের প্রাচীর তৈরী করেন, স্ত্রী পায়ে শৃংখলের মতো জাড়িয়ে থাকে, দোকান, ব্যবসা, বাণিজ্য, ঘরের বিভিন্ন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। ফলে আমার আর যাওয়া হয় না?
কোরআন বলছে- قل ان كان آبائكم তাদেরকে বলে দাও যে, তোমার পিতা মাতা, وابنائكم তোমাদের সন্তান, وازواجكم তোমাদের স্ত্রী, وعشيرتكم তোমাদের বংশধর,

واموال اقترفتموها এবং তোমাদের ঐ সমস্ত ধন যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছো, وتجارة تخشون كسادها এবং ঐ ব্যবসা যার ক্ষতীর উদ্বেগ তোমাদেরক জড়িয়ে রেখেছে, এবং ومساكن ترضونها এবং ঐসকল ঘর যেগুলোতে তোমার মন বন্দী হয়ে আছে।

احب اليكم من الله ورسوله جهاد في سبيل الله যদি আল্লাহ ও তার রাসুল (স.) এবং জিহাদ থেকে বেশি গুরুত্ব ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে তবে শাস্তির অপেক্ষা কর। حتى ياتي الله بامره আল্লাহ তোমাদের উপর তার শাস্তি বর্ষণ

করবেন। এই ভাবে যদি কোরআন মজীদকে প্রশ্ন করতে থাকেন তবে সে উত্তর দিতে থাকবে। আমি মাত্র কিছু ধারণা দিলাম। আপনারা নিজে একটু চিন্তা করুন। পবিত্র কোরআনের সুরা আনফাল সম্পূর্ণ-ই জিহাদ সম্পর্কে অবতির্ণ হয়েছে। সুরা তাওবাহও জিহাদ সম্পর্কে অবতির্ণ হয়েছে। সুরা মোহাম্মদ কিতাল ও জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা ফাতেহ জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা হজ্বে জিহাদের বর্ণনা এসেছে। সুরা হাদিদে লোহার ফজিলত বলা হয়েছে। যে সকল সুরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলেতে-ই জিহাদের কথা নিশ্চয় পাবেন। এখন অনুমান করেন জিহাদ কত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। যে ব্যক্তি কোরআন বুঝতে পেরেছে সে কখনো জিহাদ ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোরআন বুঝেনি, কোরআনকে পিছনে রেখেছে, অথবা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে কিভাবে বুঝবে জিহাদের গুরুত্ব।

জিহাদের মূলতত্ত্ব :

জিহাদ বুঝার জন্য প্রথমে যে কথা বুঝা জরুরী তা হলো আল্লাহ পাক যে ইবাদতের যে নাম দিয়েছেন তা সেই ইবাদতের জন্য-ই ব্যবহার করতে হবে। নামাজের আরবী হলো সালাত, সালাতের অন্য অর্থও আছে, কিন্তু আল্লাহ পাক সালাত শব্দ দিয়ে নামাজ বুঝিয়েছেন। তাই যে এবাদতের জন্য সালাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাকে-ই সালাত বলতে হবে। এখন যদি কোন আলেম বলেন আমি অভিধানে দেখেছি সালাত অর্থ নিজের শরীরের পিছনের অংশকে নাড়া। তাই সকালে আমি যে ব্যয়াম করি তাও সালাত। কিংবা কেউ যদি বলে সালাত অর্থ রহমত বর্ষণ। তাই সকালে উঠে আমি রহমতের জন্য প্রার্থনা করি। আমার নামাজ পড়তে হবে না। তবে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে। মোটেও না। আমরা মেনে নিলাম যে, সালাত অর্থ শরীর নাড়া চাড়া করা কিংবা অন্যকিছু। কিন্তু আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন সালাত এই ইবাদতের নাম যার মধ্যে অজু করতে হবে, কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে, ইমামের ইকতেদাহ করতে হবে, যার মধ্যে কিয়াম, রুকু, সেজদা করতে হবে। এসব ছাড়া অন্য কিছুকে কেউ নামাজ বলতে পারবে না। বললেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্তমানে একদল আছেন যারা বলেন যে, কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন; أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

নামাজ এজন্য পড় যাতে আমাকে স্মরণ করতে পার, তা হলে নামাজের কি প্রয়োজন? আলেমদের কি প্রয়োজন? আলেমরাতো এই ধারণা পোষণকারীদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ পাক সালাত

শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তারা তা না মেনে অন্য অর্থ নিয়েছে। তেমনি আল্লাহ পাক রোজা যে ইবাদতের নাম রেখেছেন তাকে রোজা-ই বলতে হবে। যদি কেউ বলে আরবী অভিধানে "সাওম" অর্থ বিরত থাকা। তাই ঘন্টা খানিক সময় সব কিছু থেকে বিরত থাকলেই রোজা আদায় হয়ে যাবে। এ কথা কি গ্রহণযোগ্য? রোজা তো এই ইবাদতের নাম যেখানে সুবেহ সাদেক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, এবং স্ত্রী সহবাস থেকে রোজার নিয়তে বিরত থাকা। কোরআন-হাদিসে রোজার যে ফাজিলত বলা হয়েছে তা একমাত্র এই ইবাদতের মাধ্যমে-ই পাওয়া যাবে।

এই রকম আল্লাহ পাক জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এক ইবাদতের নাম রেখেছেন। এই ইবাদতের বৈশিষ্ট্য হলো তলোয়ার থাকবে, ঘোড়া থাকবে, মুসলমান কাফেরদের মোকাবেলা করবে, যারা লড়াই করবে তাদেরকে মুজাহিদ বলবে, জীবিতকে গাজী এবং মৃত্যু ঘটলে শহীদ বলা হবে, যে ইবাদতে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাকে জিহাদ বলে এবং কোরআন হাদিসে বর্ণিত সকল ফজিলত এই জিহাদের জন্য-ই। কোন মানুষ যদি বলে আমি আরবী অভিধানে দেখেছি জিহাদ অর্থ মেহনত করা। তাই যে কোন মেহনতকে জিহাদ বলা যাবে। যেমন বাচ্চা লালন-পালন, পরিবারের রক্ষনাবেক্ষনও জিহাদ, তবে সে ব্যক্তিকে মিথ্যুক ছাড়া আর কি বলা যায়? কারণ মদীনার গালিতে যখন ঘোষনা হতো; জিহাদে এসো, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তলোয়ার, ঘোড়া নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার লোভে কাফেরদের মোকাবেলায় ময়দানে যেতেন। হযরত নবী করিম (স.) এর সাহাবা (রা.)গণ কখনো জিহাদের অন্য অর্থ বলেননি। আমাদের ফুকাহায়ে কেরামদের কিতাব সমূহ উঠিয়ে দেখুন জিহাদ কাকে বলে?

ফতহুল বারী' তে বলা হয়েছে;. بذل الجهد في قتال الكفار

নিজের সম্পূর্ণ শক্তিকে কাফেরদের মোকাবেলায় ব্যবহারকে জিহাদ বলে। (ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃঃ-২)

হযরত আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী, ইমাম হাম্বলী (র.)দের ফতোয়া খুলে দেখুন, তারা জিহাদের সংজ্ঞায় কি বলেছেন? তাদের সকলের ফতোয়ার সারমর্ম কি তাই নয় যে, بذل احسن الجهد في قتال الكفار

নিজের সর্ব প্রকার প্রচেষ্টাকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার এবং মুজাহিদদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্যকে জিহাদ ও কিতাল বলে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে জিহাদ শব্দ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থে এসেছে। আপনারা শোনলে আশ্চর্য হবেন যে, অনেকে জীবিকার সন্ধান, সত্য কথা বলা ইত্যাদিকে জিহাদ বলে তৃপ্তি অনুভব করেন। আমরা স্বীকার করি এ সবকে

জিহাদের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কারণ, যে জিনিষের প্রতি মুসলমানদের প্রবনতা ও ভালোবাসা অত্যন্ত বেশি হয়ে থাকে তা দিয়ে ফায়দা উঠানোর জন্য অন্য জিনিসের সাথে উপমা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন আমাদের সমাজে পিতার মর্যাদা অত্যন্ত, বলা হয়েছে; পিতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান। ইসলামে এই রকম ইজ্জত দেওয়া হয়েছে পিতাকে। এক ব্যক্তি তার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। সে তার পিতার প্রত্যেক কথাকে শ্রদ্ধার সাথে মান্য করে। পরিচিত সবাই অবগত যে, এই ব্যক্তির একমাত্র দুর্বলতা তার পিতা। একদিন একজনের ঘরে এক বৃদ্ধ মুসাফির আসলো। সে শীতে কাঁপছে। কিন্তু তাকে রাখার মতো ঐ লোকের জায়গা নেই। তখন ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যে তার পিতাকে মহব্বত করে। তাকে বলা হলো, ভাই! এই বৃদ্ধ এক মুসাফির। তাকে নিজের পিতার বয়সী মনে করে একটু সেবা কর''। এই পিতা শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? কারণ এই ভদ্রলোক তার পিতাকে মহব্বত করে। এই মহব্বতের কিছু অংশ যাতে এই বৃদ্ধকে দেওয়া হয় সেজন্য পিতার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

জিহাদের মাধ্যমে সম্মান বৃদ্ধি :

ইসলামী সমাজে জিহাদ এত-ই আনন্দদায়ক ও প্রিয় কর্ম ছিলো যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে সম্মানজনক অবস্থানে পৌছেছেন তা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সাহাবায়েকেরামদের (রা.) মধ্যে সম্মানজনক পরিচিতি এভাবে ছিলো যে, তিনি বদরওয়ালী সাহাবী, তিনির ওহুদওয়ালী সাহাবী, তিনি হোনাইনওয়ালী সাহাবী, তিনি সালমা বিন আকুয়া (রা.), যিনি মহানবী (স.) এর সাহাবীদের মধ্যে পাদল বাহিনীর সব চাইতে দ্রুতগামী ছিলেন। তিনি হযরত কাতাদাহ (রা.) যিনি ঘোড়া আরোহীদের মধ্যে সবচাইতে দ্রুতগামী ছিলেন। হাদিসের মধ্যে এসেছে যে, মহানবী (স.) শুধু সায়াদ ইবনে আবি ওক্কাস ছাড়া এমন করে কাউকে বলেননি যে, তোমার উপর আমার পিতা মাতা উৎসর্গ করলাম। এক জিহাদে মহানবী (স.) বলেন; ارم يا سعد হে সায়াদ! আমার পিতা মাতা তোমার উপর উৎসর্গ করলাম তুমি কাফেরদের উপর তলোয়ার চালাও। غسيل الملائكة জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের কারণে-ই হযরত হানজালা (রা.)কে ফেরেস্তা কর্তৃক গোসল দেওয়া হয়েছে। হযরত হামজা (রা.)কে সাইয়্যেদুশ শোহাদা অর্থাৎ শহীদদের সর্দার বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)কে এই জিহাদের কারণেই বলা হয়েছে আসাদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বাঘ। এই জিহাদ-ই হযরত সাহাবায়ে

কেরাম (রা.)কে এমন সম্মানিত করেছে যা আমরা ধারনাও করতে পারবো না। সাহাবয়ে কেরামদের মধ্যে জিহাদ এত আনন্দদায়ক ছিলো যে, মহিলাগণ তাদের স্বামীদেরকে বলতেন; জিহাদের ময়দানে শহীদ হও, ঘরের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে না। একদিন মদিনায় জিহাদের আহবানের সাথে সাথে একদিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেলো। কয়েকজন সাহাবা গিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধা মহিলা কাঁদছে। জানতে চাইলেন কারণ? সে বললো আমার কোন যুবক ছেলে নাই যাকে জিহাদে প্রেরণ করবো, স্বামীও নাই যে জিহাদে যেতে পারবে, অথচ আজ মদিনার প্রত্যেক ঘর থেকে মুজাহিদগণ জিহাদে যাচ্ছেন। এই বরকত থেকে যে আমি বঞ্চিত, তাই কাঁদছি। আমি আমার মাথার চুল কেটে দিচ্ছি তোমরা মহানবী (স.)কে দিও যাতে তিনি কোন ঘোড়ার লাগাম তৈরীতে ব্যবহার করতে পারেন। এতে আমি শান্তনা পাবো এই ভেবে যে, এই বৃদ্ধাও জিহাদে অংশ নিয়েছে। মদীনায় জিহাদের আহবান হতেই এক বালক এসে বললো, হে আল্লাহর নবী (স.)। আমি জিহাদে যেতে চাই। মহানবী (স.) চেয়ে দেখলেন শরীরের গঠন শক্ত আছে। বললেন, চলো। দ্বিতীয় বালক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল (স.)! ওকে জিহাদে নিচ্ছেন তবে আমাকে কেন নিবেন না? মহানবী (স.) বললেন, আরে! ও যে তোমার থেকে বড় এবং শক্তিশালী। বালকটি বললো, হে আল্লাহর রাসুল (স.) আমাদের মধ্যে কুস্তি দিয়ে দেখুন কে শক্তিশালী। কুস্তির নির্দেশ দেওয়া হলো। শুরু হলো কুস্তি। শাহাদতের লোভে কুস্তি হচ্ছে। ছোট বালক বড় বালকের কানের কাছে গিয়ে বললো, ভাই! তোমারতো জিহাদে যাওয়ার অনুমতি হয়ে গেছে। দয়া করে তুমি পরাজিত হয়ে যাও যাতে আমিও অনুমতি পেয়ে যাই। ছোট বালকের অনুরোধে বড় বালক পরাজয় স্বীকার করে নিলো। দু'জনের জিহাদে যাওয়ার অনুমতি হয়ে গেলো। ময়দানে গিয়ে লড়তে লড়তে ঐ বালকের একহাত কেটে লটকে গেলো, মাত্র একটি রগের সাথে লেগে আছে। বর্তমানে আমাদের বাচ্চারা সামান্য কাঁটা ঢুকলেই আত্মচিৎকার দিয়ে পাড়া প্রতিবেশিকে জানিয়ে দেয়। আমরা যারা বাচ্চাদেরকে খরগোশের মতো আদর যত্ন করে লালন-পালন করি তাদের চিন্তা করা উচিৎ যে, এক হাত কেঁটে মাত্র একটি রগের সাথে লেগে আছে, এমনি অবস্থায় জিহাদ করতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে বালক তার ঝুলন্ত হাতকে এক পায়ের নীচে রেখে টান দিয়ে দ্বিখন্ডীত করে নিলো।

তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মহানবী (স.) যখন মাল জমা করতে ঘোষণা দিলেন তখন হযরত ওমর ফারুক (রা.) ভাবলেন যে, আজ জিহাদের পথে মালদানে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)থেকে এগিয়ে থাকবো, কারণ

এই দিন তার ঘরে প্রচুর মাল জমা ছিলো। তিনি ঘরের অর্ধেক মাল উঠিয়ে এনে মহানবী (স.)এর সামনে রাখলেন। কিন্তু অন্যদিকে হযরত আবুবকর (রা.) ঘরের সম্পূর্ণ মাল উঠিয়ে এনে মহানবীর (স.) সামনে রাখলেন।

সামান্য কিছু সাহাবী ছিলেন, অথচ রোম ও পারস্যকে পরাজিত করে দিলেন। বড় বড় দূর্গ বিজয় করলেন। এক যুদ্ধে দশ হাজার সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। সমরকন্দ পর্যন্ত আমি নিজে তাদের কবর দেখেছি। কাবুলে পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এসেছেন। তাদের কাছে জিহাদ এত-ই আনন্দদায়ক এবং প্রিয় বস্তু ছিলো যে, যিনি পাপের কাফ্ফারা দিতে চাইতেন তিনি-ই জিহাদে চলে যেতেন। তাদের পক্ষে তা এজন্য-ই সম্ভব হতো যে, জিহাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিলো।

ইহুদীগণ বললো; আমরা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়।

বলা হলো; এসো পরিক্ষা দাও فتمنوا الموت ان كنتم صادقين

সত্য হলে মৃত্যু কামনা কর।

কারণ প্রত্যেক আশিক তার মাশুকের সাথে সাক্ষাৎ চায়, প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে দেখা করতে চায়। তাই মৃত্যু হলে না আল্লাহর কাছে যাবে। কিন্তু فلن يتمنوه ابدا

যখন মুত্যুর সময় হলো তখন তারা পালিয়ে গেলো এবং বললো, না মৃত্যু চাই না।

হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহর প্রেমের দাবী করো আবার মৃত্যু থেকে, শাহাদত থেকে পালিয়ে থাক। তোমাদের মধ্যে আর ইহুদীদের মধ্যে ব্যবধান কি থাকলো? এজন্যই জিহাদের উদ্দেশ্য অতীতে যা ছিলো আজো তাই আছে। এই উদ্দেশ্য কে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আমি স্বীকার করি জিহাদ শব্দ পবিত্র কোরআন কিতাল ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সালাত শব্দ ও নামাজ ছাড়া অন্য কারণেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ان الله وملائكته يصلون على النبى

আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তাগণ নবী (স.) এর উপর শান্তি (সালাত) বর্ষণ করেন।

এই সালাত শব্দ দিয়ে এখানে বুঝানো হয়েছে নবী করিম (স.) এর উপর আল্লাহ রহমত বষর্ণ করেন এবং ফেরেস্তাগণ রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করেন। এখানে সালাত শব্দ নামাজ ছাড়া অন্য কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে যখন 'সালাত' শব্দ দিয়ে নামাজকে বুঝানো হয় তেমনি জিহাদ শব্দ বিভিন্ন উপমায় ব্যবহৃত হলেও সাধারণ ভাবে জিহাদ এমন বিশেষ ইবাদতকে বুঝায় যেখানে থাকবে তলোয়ার, তীর, ঘোড়া, শাহাদত, গণিমত,

গাজী ইত্যাদি এবং এর দ্বারা ইজ্জত ও শ্রেষ্টত্ব অর্জিত হয়। জিহাদের এই অর্থ অতীতেও ছিলো, আজো আছে এবং আগামীতেও থাকবে। এক হাজার মির্যা কাদিয়ানীর জন্ম হলেও এই অর্থে পরিবর্তন আনতে পারবে না। এক সময় ছিলো যখন কোন মুসলমান ঘোষণা দিতেন, জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তখন সব মুসলমান যার যা আছে তা নিয়ে বেরিয়ে ময়দানে গিয়ে কাফেরদেরকে নেস্তেনাবুদ করে দিতেন কাফেরগণ যখন ময়দানে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো তখন তারা জিহাদের অর্থ এবং উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র শুরু করলো, তারা এমন ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করলো যা শোনলে দুঃখে হৃদয় ফেটে যায়।

জিহাদ হলো ইসলামের দূর্গ :

জিহাদ মুসলমান ও ইসলামের দূর্গ ও প্রতিরক্ষক ছিলো। জিহাদের শক্তির কারণে আমরা নামাজ পড়তাম, আজান দিতাম, ইসলামের দাওয়াত গোটা বিশ্বে নিয়ে যেতাম। কারো বাধা দানের সাহস হতো না। আর যদি কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করতো তবে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যেত। কেউ আমাদের সংস্কৃতিতে কিছু ঢুকাতে পারতো না। কেউ আমাদের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার সাহস পেত না। আজ আমরা জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের সকল প্রতিরক্ষক দেওয়াল কাফেরগণ ভেঙ্গে দিচ্ছে। তারা আমাদের সংস্কৃতির উপর আক্রমণ করছে। বিভিন্ন ভাবে ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। এমন কি তারা আমাদের জীবিকার উপরও হামলার সাহস দেখাচ্ছে। (বাস্তব প্রমাণ-ইরাক, সুদান, লিবিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি মুসলিম দেশ গুলোর উপর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধ)। আমাদেরকে তারা গোলাম করে রেখে দিয়েছে। আমাদের ইবাদতের উপর তারা হস্তক্ষেপ করতে আমাদের ইবাদতকে তারা কষ্টের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। আমাদের উলামাদেরকে তারা বিভিন্ন ভাবে অপমানিত করছে। এটা-ই নিয়ম যে, যখন রক্ষক কিংবা চৌকিদার থাকে না তখন চোর, বদমাইশগণ যা ইচ্ছা তা করে, কেউ প্রতিরোধকারী থাকে না। কিন্তু যদি প্রতিরোধকারী থাকে তবে কার এত সাহস কোন শিশু মেয়ের মাথা থেকে উড়না সরানোর? স্মরণ রাখতে হবে যে মুসলমান প্রতিমূহুর্ত জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং সর্বদা প্রাণ উৎসর্গ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখুন। যখন ইংরেজদের অবস্থা সোচনীয়। চারিদিকে উলামায়ে কেরাম জিহাদের দামামা বাজাচ্ছেন। ময়দান উত্তপ্ত। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তিও জিহাদের ময়দানে। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ

ইসমাইল শহীদ (র.) এর জিহাদী ইতিহাস ইংরেজদের সামনে স্পষ্ট। মুসলমানেদের শিশুরা পর্যন্ত জিহাদ বুঝে এবং মানে। তখন-ই ইংরেজগণ শুরু করলো জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত এবং এই ষড়যন্ত্রের-ই জারজ মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। মীর্জা কাদিয়ানী নিজে বলেছে যে, আমি বৃটিশ শাসনের পক্ষে তাদেরকে খুশি করার জন্য এত বই লিখেছি যে, পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হয়ে যাবে।"

এই কুখ্যাত লোকটি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের বিরুদ্ধে প্রচুর অপপ্রচার করেছে। হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (র.) যখন মানুষের মধ্যে জিহাদের দাওয়াত দিতেন তখন এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি মানুষের মাঝে অপপ্রচার করতো এই বলে যে, হে মুসলমানগণ! জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ নয়। কারণ জিহাদের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা তোমাদের নেই। শক্তি ছাড়া জিহাদ হবে না। তা ছাড়া জিহাদের জন্য এক আমীরের প্রয়োজন কিন্তু তোমাদের আমীরও নেই।" এই ভ্রান্ত ধারণা কাদিয়ানীগণ এতই প্রচার করেছে যে, বর্তমানে অনেকে-ই মুর্খতা বশত ফতোয়া দিয়ে বসেন। যেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সেখানে জিহাদ হয় না। কাদিয়ানীগণ আরেকটি কথা এত-ই প্রচার করেছে যে, জিহাদে কোন পাপিষ্ট লোকের মাধ্যমে হয় না। জিহাদ করতে হলে ফেরেস্তাদের মতো চরিত্র থাকতে হবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চরিত্র ফেরেস্তাদের মতো হবে না সেই পর্যন্ত জিহাদ করতে পারবো না। কিন্তু এটাও একটা ভ্রান্ত ধারণা। যারা জিহাদের জন্য ফেরেস্তা হওয়া শর্ত মনে করেন তাদের সামনে মৃত্যু এসে যায় তবু জিহাদ সম্ভব হয় না। জানি না এই সমস্ত ধারণা পোষণকারীর ঈমান ও আমলের অবস্থা কোন দিন এমন হবে যে, তারা জিহাদের যোগ্য হবেন? অথচ জিহাদের বিনিময়ে-ই ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পাপ মাফ হয়।

বন্ধুগণ! সাতাঁর শিখতে হলে পানিতে যেতে হয়। কেউ যদি পানিতে না গিয়ে দশ বছর হাত-পা চালায় তবু সাতার শিখতে পারবে না। তেমনি জিহাদের জন্য যে ঈমান ও আমলের প্রয়োজন তা অর্জন করতে হলে জিহাদে যেতে হয়। জিহাদের বাইরে থেকে তা অর্জন সম্ভব নয়। দশ বছর যদি কোন মানুষকে ঈমান শিক্ষা দিয়ে এমন অবস্থায় পৌছাতে পারো যা তোমার দৃষ্টিতে ঈমানের কষ্টি পাথর, তবু এক গুলির শব্দ শোনালে কিংবা ভালো করে এক ধমক দিলে সে বেহুশ হয়ে যাবে। কিন্তু জিহাদের ময়দানে দশ দিনের মধ্যে এতটুকু ঈমান শক্ত হয় যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুকে ভয় করে না। জিহাদের ময়দানে যখন বোমা ফাটে তখন আমাদের সাথীদের শরীর গাছের মধ্যে ঝুলে থাকে। শরীর খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় পা, মাথা, হাত ইত্যাদি পৃথক

হয়ে যায়। মগজ বের হয়ে আসে। আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় সাথীদের শরীরের অংশগুলো জমা করে থাকি আল্লাহর কসম! ভয় কিংবা কাপুরুষতা আমাদেরকে স্পর্শ করে না। জিহাদ ঈমানকে শক্ত করে দেয়। জিহাদ ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়। জিহাদের জন্য তা দেখা হয় না যে আমার শরীর মজবুত কি না, বরং জিহাদের জন্য দেখা হয় দ্বীন নিরাপদ কি না। মুজাহিদ গণ নিজেদের শরীরের অংশকে খন্ড-বিখন্ড করে চেষ্টা করেন উম্মতে মুসলিমাকে সংঘবদ্ধ করতে। জিহাদে হযরত হামজা (রা.) এর মতো সাহাবীর শরীর খন্ড-বিখন্ডিত হয়েছিলো। তাঁর নাক, কান কেটে দেওয়া হয়েছিলো। যদি আমাদের শরীর খন্ড বিখন্ড কিংবা আমাদের নাক, কান কেটে দেওয়া হয় তবে কি কিয়ামত হয়ে যাবে?

জিহাদের ময়দানে নামাজ :

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, মুজাহিদগণ দাড়ি রাখেন কি না? নামাজ নিয়মিত পড়েন কি না? আমি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই যে, কে বলেছে জিহাদের জন্য দাড়ি ও নামাজ শর্ত? স্মরণ রাখতে হবে, নামাজ পৃথক একটি ফরজ। জিহাদ পৃথক একটি ফরজ। দাড়ি পৃথক একটি ওয়াজিব। দাড়ি নামাজ এবং জিহাদ সব কিছু-ই জরুরী যদি আপনারা দেখতেন তবে স্বীকার করতেন যে, আল্লাহর কসম মুজাহিদগণ যেভাবে নামাজ পড়েন তা আর কারো পক্ষে সম্ভব না। বিশ্বাস করুণ "নামাজে প্রেম আসে তলোয়ারের ছায়ার নীচে"। একদিকে গুলি বর্ষণ হচ্ছে অন্য দিকে মুজাহিদ বলেছেন;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। সুরা ফাতেহা-১

এই সময় আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনায় যে স্বাদ পাওয়া যায় জিহাদের বাহিরে তা কোথাও অনুভব করা যায় না।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সরল সহজ পথে পরিচালিত কর। (সূরা ফাতেহা-৫)

যে পথে তোমার নবী, রাসুল, সিদ্দিক এবং শহীদগণ চলে গেছেন। যে মুহূর্তে মানুষের এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে, যে কোন সময় বুলেট লেগে নামাজ অবস্থায় মৃত্যু এসে যেতে পারে, তখন সেই নামাজে স্বাদ আসে। যদি মুজাহিদগণ বেনামাজী হতেন তবে আকাশ থেকে সাহায্যের জন্য ফেরেস্তা আসতেন না। সোভিয়েত রাশিয়ার বড় বড় জেনারেলগণ স্বীকার করেছেন,

ফ্রান্সের এক সাংবাদিক বলেছেন যে, তিনি আফগানিস্তানে জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আল্লাহকে দেখেছেন, তাই ময়দান থেকে ফিরে এসে নিজে মুসলমান হয়ে গেছেন। যদি মুজাহিদগণ পাপিষ্ট হতেন তবে আল্লাহর সাহায্যে এত বড় বিজয় তাদের দ্বারা কিভাবে সম্ভব হতো। জিহাদ মনকে পাপ মুক্ত এবং পরিশুদ্ধ করে দেয়। জিহাদের ময়দানে শয়তান যেতে পারে না। কারণ সেখানে যে সকল ফেরেস্তা থাকেন তাদেরকে শয়তান দেখে ভয় পায়।

হাদিসের মধ্যে এসেছে মুজাহিদগণ যে দোয়া করেন তা আম্বিয়া (আ.) দের মতো কবুল হবে। কারণ মুজাহিদদের কোন আমলে অহংকার থাকে না।

জিহাদের ভিত্তি :

জিহাদের ময়দানে যারা শাহাদত বরণ করেন তাদের বেশির ভাগের রক্ত থেকে খুশবো বের হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমি নিজে সেই ঘ্রাণ পেয়েছি। অনেক মানুষ নিজে জিহাদে যায় না এবং অন্যদেরকেও জিহাদ থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন প্ররোচনা দেয়। আমাকে অনেকে এভাবে প্ররোচনা দিয়ে থাকেন যে, যদি তুমি জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়ে যাও তবে দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি শহীদের রক্ত থেকে যে খুশবো পেয়েছি তার ঘ্রাণ আমাকে সকল ভ্রান্ত প্ররোচনার প্রভাব থেকে মুক্ত করে রাখছে। আল-হামদুলিল্লাহ, আমি এখনো দুই কারণে জিহাদের সাথে মিশে আছি। এ কথা যখন পড়লাম যে, ওহুদের ময়দানে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর রক্ত ঝরেছে, দাঁত শহীদ হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমার সাথী শহীদদের রক্ত থেকে যে খুশবো পেয়েছি। তাই এখন যদি কেউ জিহাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে তবে আমি মানি না। কারণ যে জিহাদে আমাদের প্রিয়নবী (সা.) এর রক্ত এবং দাঁত দিতে হয়েছে সেই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। জিহাদ কোন গল্প কিংবা কাল্পনিকতার উপর ভিত্তি করে নয়। জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের ভূমিকা লিখা হয়েছে আমাদের প্রিয়নবী (সা.) এর লাল রক্ত দিয়ে। যদি জিহাদ ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অন্য কোন পথ বা পন্থা থাকতো তবে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র রক্ত ঝরাতে (দাঁত শহীদ করতে) কেন গেলেন? আমাদের মতো তিনিও যে পারতেন কোন সহজ-সরল পথ খুঁজে নিতে। মহানবী (সা.) এর রক্ত প্রবাহিত হবে, তাঁর দাঁত শহীদ হবে আর আমরা উম্মতগণ ভাবছি আমাদের সমস্যার সমাধান জিহাদ ছাড়া-ই হয়ে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে, কারো শাহাদতের কারণে

দ্বীনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় না। বরং কাজ বৃদ্ধি হয়। আমি যখন আফগানিস্তানে জিহাদে গেলাম, তখন আমার কামান্ডার ছিলেন শহীদ আব্দুর রশীদ (র.)। তার শাহাদতের সময় এত কষ্টদায়ক অবস্থা ছিলো যে স্বয়ং মুজাহিদগণ চিন্তিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি হাসছেন এবং হাসতে হাসতে শহীদ হয়ে গেলেন। সাথীরা আমাকে অনুরোধ করলেন অন্যান্য মোর্চায় গিয়ে মুজাহিদদেরকে এই দুঃসংবাদ দিতে যে, তাদের প্রিয় কামান্ডার শহীদ হয়ে গেছেন। কামান্ডার আব্দুর রশীদ এত বিজ্ঞ ও সাহসী ছিলেন যে, শত্রুর গুলি বর্ষণের মধ্যে এমনভাবে অগ্রসর হতেন যেন ফুল বাগানে প্রবেশ করছেন। তিনি শত্রুদের শক্তিশালী মোর্চাগুলোকে অতিসহজে দখল করে নিতেন। একবার বুলেটহীন কালসনিকফ নিয়ে তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে তিনি সতেরো জন রাশিয়ান সৈন্যকে গ্রেফতার করেছিলেন। এত বড় মুজাহিদ কামান্তার হয়েও তিনি তান্দুরীর মধ্যে মুজাহিদদের জন্য নিজের হাতে রুটি তৈরি করতেন।

আমি গুলি থেকে আত্মরক্ষা করে করে সামনের মোর্চায় গেলাম। সাথীদেরকে সমবেত করে পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করলাম। এরপর বললাম আমাদের প্রিয়নবী (স.)ও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)গণ এই দুঃখ সহ্য করেছেন। আমাদের প্রিয় কামান্ডার আব্দুর রশীদ শহীদ হয়ে গেছেন। আমাদেরকে সহ্য করতে হবে। সংবাদ শোনে মুজাহিদদের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হলো তা সত্যই আশ্চর্যজনক। কামান্ডার আব্দুর রশীদের শাহাদতের পর আমাদের ধারণা ছিলো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর বিধান হলো শহীদের মৃত্যু নেই। কামান্ডার আব্দুর রশীদের শাহাদতের পর আল্লাহপাক অন্য কামান্ডার দিয়ে দিলেন। নতুন কামান্ডার যখন ময়দানে চলতেন তখন মনে হতো শহীদ কামান্ডার আব্দুর রশীদ সাথে রয়েছেন। কামান্ডার মাওলানা শিব্বির, তার সংস্পর্শে যুদ্ধ করে কয়েকবার মহানবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি যখন শহীদ হলেন তখনও আমাদের ধারণা হয়েছিলো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাক এরপর আরো ভালো কামান্ডার দিলেন। মোট কথা হলো শাহাদতের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ বন্ধ হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। শহীদের রক্ত ইসলামের গাছকে উঁচু করতে পানির কাজে আসে। ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে যে তেলের প্রয়োজন তা শহীদের রক্ত।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কোরবাণীর প্রয়োজন :

কমিউনিজমের ধ্বংস এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোরবাণী দিতে মক্কা থেকে শায়েখ উসামা বিন লাদিন আফগানিস্তানে এসেছেন। ইসমাঈল খান, মাওলানা ফজলুর রহমান খলিল এবং শহীদ কামান্ডার আব্দুর রশিদ ঘর ছেড়ে ময়দানে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে মুফতি আবু উবায়দাসহ আরব ও মিশর থেকে যুবকগণ আফগানিস্তানে এসেছেন। রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়-ই আজ চিন্তিত এই ঈমানী লস্কর কোথা থেকে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভূমি থেকে মুসলমান এবং আকাশ থেকে ফেরেস্তাদের তের বছরের যুদ্ধের বিনিময় শুধু আফগানিস্তানের মাটি থেকে নয় বরং গোটা দুনিয়া থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম ও কমিউনিষ্ট নীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামের একটি মুস্তাহাবও ধ্বংস হয়নি। আমরা নীতিগত কারণে যুদ্ধ করি। আমরা মোটেও কাঁদবো না যে আমাদের ষোল লাখ শহীদ হয়ে গেছেন। কারণ আমরা যে নীতির কারণে যুদ্ধ করি সে নীতি এখনো বাকী আছে। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ আজ কাঁদছে যে, তাদের নীতির সাথে সাথে তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁরা এসেছিলো আল্লাহর জানাজা বের করতে কিন্তু আজ স্বয়ং তাদের জানাজা বের হয়ে গেছে। তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছিলো আকাশের খোদাকে নীচে নিয়ে আসবে। অথচ তাঁরা আকাশের খোদার জমিনী বান্দাদের মোকাবেলা করার-ই সাহস রাখে না। প্রিয় বন্ধুগণ! ইসলামে যুদ্ধ শরীর দিয়ে করে না, করে নীতি দিয়ে। আমরা আমাদের নীতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ইসলামী নীতির জন্য যারা লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন। মসজিদে নববীতে হযরত ফারুকে আজম (রা.) বক্তব্য দিচ্ছেন, এই সময় তাঁর এক কামান্ডার শত মাইল দূরে লড়াইয়ে ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে ঐ কামান্ডার হঠাৎ শোনতে পেলেন, يا سارية الجبل হে সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দাও। হযরত সারিয়াহ (রা.) পিছন দিকে ঘুরে গেলেন। শত্রু আক্রমণ করতে ছিলো। কিন্তু সংকেত পেয়ে মুসলমানগণ পাল্টা আক্রমণ করলেন। ফলে শত্রুদল পরাজিত হলো। হযরত সারিয়াহ (রা.) ময়দান থেকে ফিরে আসার পর সাহাবা (রা.) জানতে চাইলেন যুদ্ধ কেমন হলো? তিনি বললেন, আমরা পরাজিত হওয়ার পথে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এক আওয়াজ পেলাম "হে সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর।" আওয়াজটা হযরত উমর (রা.) এর আওয়াজের মতো। তখন সাহাবারা (রা.) বললেন, আমরা মসজিদে হযরত উমর ফারুক (রা.) এর বক্তব্য শোনছিলোম। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "হে সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি কর।"

মোটকথা মহান আল্লাহ পাক মুজাহিদদেরকে হাওয়া, পানি, সমুদ্র, জংগল, পশু-পাখি, হিংস্র জানোয়ার দিয়েও সাহায্য করে থাকেন। কমিউনিজমের পরাজয় এবং ইসলামের বিজয় দুনিয়া কিভাবে সহ্য করবে? আমেরিকার পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে এই কথা ভেবে যে, আমরা তো ওদের সাথে সাহায্যের নামে প্রহসন করলাম কিন্তু ওরা এত বড় মুভমেন্ট কিভাবে করলো? বর্তমানে দশ লাখ আফগান মুজাহিদ ময়দানে লড়াই করার শক্তি রাখেন। ওরা দুনিয়ার অন্যান্য সৈন্যদের থেকে বেশি যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে অবগত। কারণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সৈন্যগণ যুদ্ধ শিখে দেওয়ালে গুলি চালিয়ে। কিন্তু আমরা যুদ্ধ শিখেছি রাশিয়ানদের মাথায় গুলি চালিয়ে। ওরা যে ময়দানে ট্রেনিং করে সেখানে কার্পেট বিছানো থাকে, আর আমরা, যেখানে ট্রেনিং করেছি সেখানের মাটি ভাংগা কংক্রিটের মতো। ওরা তীর দিয়ে কাগজে নিশান লাগায় আর আমরা বুলেট ভর্তি বন্দুক দিয়ে শত্রুর বুকে নিশান লাগাই। যুদ্ধ প্রেমিকদের মোকাবেলা কোন কাগজের নিশানধারী জেনারেল কর্তৃক করা সম্ভব নয়। তাই তারা ভয় পায় এবং আমাদেরকে মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালি দেয়। অথচ নামাজ আমরা অতীতেও পড়তাম এবং আজও পড়ছি।

আজ ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। হিন্দুস্তানে জিহাদ শুরু হয়ে গেছে, তাজিকিস্তানে জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। কাশ্মীরে জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত দুনিয়ায় সর্বসাধারণের কাছে জিহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবকেরা তাদের মা-বাবা ছেড়ে জিহাদে যাচ্ছে। স্ত্রী'রা তাদের স্বামীদেরকে জিহাদে প্রেরণ করছে। আমাদের এবং আপনাদের সবাইকে প্রস্তুত হতে থাকতে হবে শত্রুর মোকাবেলার জন্য।

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ :

অঘোষিত ক্রুসেড
জীবন-ধর্ম-সংস্কৃতি
গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ
কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাবিজাত শিরক নয় কি?
লাহোর থেকে কান্দাহার
তালেবান শাসক ও শাসনের উপমা (অনুবাদ)
রমজানের মাসআলা-মাসায়েল
জিয়ারতে মক্কা মদীনা

জিহাদের ইসলামী নীতি

মূল

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ

সৈয়দ মবনু

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০০৪

প্রকাশক
অধ্যয়ন
২/১ জামে মসজিদ মার্কেট
বন্দরবাজার, সিলেট।
মোবা ০১৭১ ১২৬০৮৩

প্রচ্ছদ
সিটি কম্পিউটার গ্রাফিক্স
বারুতখানা, সিলেট।

মুদ্রণ
সিটি অফসেট প্রেস
উত্তরণ ১৮/৮, বারুতখানা, সিলেট।
মোবাইল ০১৭১ ৩৮৯২৬৫

মূল্য
১৫ টাকা মাত্র

"... জাতিসংঘের কাছে আমরা কেন দাবী করবো? জাতিসংঘের কি বসনিয়ার পঁচিশ হাজার মাসুম বাচ্চাদের রক্ত দৃষ্টিতে আসছে না? জাতিসংঘের মহাসচিবের কি কাশ্মিরে প্রবাহিত রক্ত যা সমুদ্রের পানিকে লালে লাল করে দিয়েছে তা দৃষ্টিপাত হচ্ছে না? ওরা গোটা বিশ্বে খৃষ্টান আর ইহুদীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আজ যদি গোটা বিশ্বে প্রকৃত কোন এতিম থেকে থাকে তবে সে হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মত; যাদের মাথায় সান্তনার হাত রাখার মত আজ কেউ নেই। যাদের মা-বোনগণ অন্যায়ভাবে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাচ্চা জন্ম দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করছে। যাদের গর্ভবর্তী মহিলারাও গণহারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, কিন্তু প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। এটা আমাদের অপরাধ এবং এজন্য আমরাই অপরাধী। আমাদেরকে মহানবী (সা.) জিহাদ শিখিয়েছিলেন এবং তলোয়ার আর ঘোড়া দিয়েছিলেন। বোখারী শরীফ হাতে নিয়ে দেখুন। মহানবী (সা.) নিজের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই রেখে যাননি। হে আমার মুজাহিদ বন্ধুগণ! সংকল্প করুন; ইসলামের সকল মাসয়ালার জন্য নিজের প্রাণের নজরানা দেবেন, নিজের রক্ত প্রবাহিত করবেন, তবু শত্রুর সামনে নিজের অস্তিত্বকে বাঁকা হতে দেবেন না... "।

মাওলানা মাসউদ আযহার

প্রকাশক :

অধ্যয়ন

২/১ জামে মসজিদ মার্কেট, বন্দর বাজার, সিলেট।
মোবাইল : ০১৭১-১২৬০৮৩